শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত

'আমার এখন যে চেহারা দেখছিস', বললেন তারিণীখুড়ো, 'তা থেকে আমার ইয়াং বয়সের চেহারা তোরা কল্পনাই করতে পারবি না।'

'কীরকম চেহারা ছিল আপনার, খুড়ো?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা, 'ধর্মেন্দরের মতো?'

'য্যা য্যাঃ!' বললেন খুড়ো, 'ওরকম নাসপাতিমার্কা চেহারা নয়। টক্‌টকে রং, ব্যায়াম করা পাকানো শরীর, জামা খুললে প্রত্যেকটি মাস্‌ল আঙুল দিয়ে দেখানো যায়—অ্যানাটমির চার্টের দরকার হয় না।—আর ফিল্ম স্টারের কথা কী বলছিস? কত অফার পেয়েছে জানিস খুড়ো হিরো হবার জন্যে?'

'ইস্—আর আপনি নিলেন না?' বলল ন্যাপলা। 'অবিশ্যি তখন তো বোধহয় সাইলেন্ট ছবি, তাই না?'

'কে বললে সাইলেন্ট? আমি বলছি স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের কথা। সাইলেন্ট ছবি তো ফুরিয়ে গেছে ত্রিশ সনের কিছু পরেই।'

'আপনি রিফিউজ করলেন?'

'আলবৎ! একবার একটা ছবিতে করতে হয়েছিল, তবে সেটা অন্য গল্প, আরেকদিন বলব। আসলে ফিল্মের হিরো হবার শখ আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম আমার গোটা জীবনটাই হবে একটা সিনেমার গপ্‌পো। একটা খাঁটি নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার। অথবা বলতে পারিস একটা সিরিজ অফ অ্যাডভেঞ্চার্স। রং মেখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব, ডিরেক্টরমশাই ডুগডুগি বাজাবেন, আর আমি নাচব—এ-শর্মা সে-শর্মা নয়।'

'আজ কোন্ অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় বলবেন, মিস্টার শর্মা?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। খুড়োকে এ ধরনের কথা বলার সাহস একমাত্র ন্যাপলারই আছে, তবে সেটা খুড়ো বিশেষ মাইন্ড করেন বলে মনে হয় না। বাইরে একটা খিটখিটে ভাব

sumon_ahm@yahoo.com

দেখালেও আসলে ওঁর মনটা নরম একটা জানতাম। বেনেটোলা থেকে বালিগঞ্জে আসেন যে শুধু আমাদের গল্প শোনাবার জন্যই এটা তো মিথ্যে নয়।

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে খুড়ো বললেন, 'নাইনটিন ফর্টি-ফোরে আজমীর। তখন আমার বয়স আটাশ।'

আমরা পাঁচজন—আমি, ভুলু, চটপটি, সুনন্দ আর ন্যাপলা—গল্পের জন্য রেডি হয়ে বসলাম। চা শেষ করে একটা একসপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে খুড়ো আরম্ভ করলেন।

আগ্রায় একটা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধরণীকাকার কথা। আমার বাবার মাস্‌তুতো ভাই। তিনি জয়পুরে হোমিওপ্যাথি করে বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। রাজস্থানটা দেখা হয়নি, অথচ ছেলেবেলা থেকেই ও-দেশটার উপর একটা আকর্ষণ রয়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষে ওটাই হল সত্যিকারের রোম্যান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের ঘাঁটি। চলে গেলুম কাকার কাছে।

আমি বেকার জেনে কাকার ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তোর মতো একজন জোয়ান ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আজমীর যাবি ?' বললুম, 'কী আছে সেখানে ?' কাকা বললেন, 'শেঠ গঙ্গারাম আমার পেশেন্ট। পেটের আলসারে ভুগত, আমার ওষুধে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তার একজন ইংরিজি জানা সেক্রেটারি দরকার। তোর তো ইংরিজিতে অনার্স ছিল। যদি চাস তো তোকে রেকমেন্ড করে দিতে পারি।'

কখন কী কাজে দরকার পড়ে, তাই টাইপিংটা আগেই শেখা ছিল। কাজেই সেক্রেটারির চাকরির পক্ষে আমি অনুপযুক্ত নই। তবু লোকটার সম্বন্ধে একটু ডিটেল জানা দরকার বলে প্রশ্ন করলুম, 'কী করেন গঙ্গারাম ?' গঙ্গারাম বললেই উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে—মনে পড়ে যায়।

কাকা বললেন, 'গঙ্গারাম মস্ত ধনী। হীরে জহরতের কারবার। বিদেশে করেসপন্ডেস চালাতে হয়। যে সেক্রেটারি ছিল সে নাকি বিয়ে করার নাম করে সেই যে গেছে আর আসেনি।'

'বস্‌ হিসেবে গঙ্গারাম কি— ?'

'কোনো গোলমাল নেই। তবে ওর একটা ছেলে আছে বছর বারো বয়স, সে নাকি একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। সে যদি কিছু করে থাকে।'

আমি বললাম, 'কুছ পরোয়া নেহী। যে ছেলের এখনো গোঁফ গজাবার বয়স হয়নি তাকে আবার ভয় কিসের ? ও আমি সামলে নেব।'

'তাহলে আর কী, লেগে পড়। আমি গঙ্গারামকে লিখে দিচ্ছি। আমার

রিকোয়েস্ট ও ঠেলতে পারবে না।'

কাকার এক চিঠিতেই গঙ্গারাম রাজি। লিখলেন, 'সেন্ড ইওর নেফিউ ইমিডিয়েটলি।' একবার অম্বর প্যালেসটায় টুঁ মেরে জয়পুর থেকে চলে গেলাম মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান আজমীরে। আকবর একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এই শহরে। আজমীর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে হিন্দুদের তীর্থস্থান পুষ্কর। সব মিলিয়ে যাকে বলে ঐতিহ্যে মহীয়ান।

প্রথম রাতটায় থাকলাম সার্কিট হাউসে। কাকাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আনাসাগর নামে বিরাট লেকের ধারে এমন সার্কিট হাউস ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে ভুলব না। হাজার হাঁস চলে বেড়াচ্ছে লেকে, পশ্চিমে তারাগড় পাহাড়, তার পিছনে টেকনিকালার ছবির মতো সানসেট হচ্ছে।

শেঠ গঙ্গারামের গদি এবং বাসস্থান শহরের মধ্যিখানে হলেও, বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকে পড়লে সেটা আর বোঝার জো থাকে না। সাতাশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। আর সেটাকে ঘিরে দুর্গের মতো পাঁচিল। আড়াই শো বছরের সোনাদানার ব্যবসা। ঘরে কত যে মহামূল্য রত্ন আর গয়নাগাটি আছে তার হিসেব নেই। সেই জন্যেই এই পাঁচিলের ব্যবস্থা—যদিও তাতেও যে ষোল আনা সেফ্‌টি হয় না সেটা পরে বুঝেছিলাম, তবে সে কথা যথাস্থানে প্রকাশ্য।

গঙ্গারামের সঙ্গে সকালে গদিতে দেখা করলুম। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, ঘি খাওয়া নধর পরিপুষ্ট চেহারা, একবার বসে পড়লে উঠতে গেলে পাশের লোককে হাত ধরে হেল্‌প করতে হয়। আমায় দেখে প্রশ্ন হল, 'আর ইউ এ বেঙ্গলী?'

এ প্রশ্নের অবশ্যি একটা কারণ আছে। সেটা এখানে বলি।

আগ্রায় থাকতে একদিন ব্যাঙ্কে এক খদ্দের আসে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনিতেই ভালো, তার উপর এক জোড়া তাগড়াই গোঁফ তাতে এমন এক পার্সোন্যালিটি এনে দিয়েছে যে দেখেই ডিসাইড করলুম ও জিনিস আমারও চাই।

আড়াই মাস লেগেছিল গোঁফের ওই শেপ নিতে। মাঝখানটা ভরাট আর পুরু, আর দুটো পাশ যেন দুটো হাতির শুঁড় সেলাম ঠুকছে। কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে থেকে গোঁফ জিনিসটা তখন প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু পশ্চিমে অনেকেই ওটার খুব তোয়াজ করে। আর রাজস্থানে তো কথাই নেই।

শেঠজীকে বললুম যে আমি বঙ্গসন্তানই বটে—গোঁফটা নেহাৎ শখের ব্যাপার।

ইংরিজিটা তো মোটামুটি বলতেই পারতুম, দু-বছর আগ্রায় থেকে হিন্দীটাও

সড়গড় হয়ে গেস্‌ল। তার উপর আদব কায়দাগুলো রপ্ত, স্বাস্থ্য ভালো, সব মিলিয়ে গঙ্গারাম খুশিই হলেন। বললেন, 'আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। সকালে বিকেলে আমার কাজ করবে, দুপুরটা আমি ঘুমোই, আর সন্ধেটা তুমি আমার ছেলের টিউশনি করবে। ছেলে চালাক, তবে পড়াশুনোয় মন নেই, ভারী দুরন্ত, সঙ্গদোষে নষ্ট না হয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি তোমাকে দেব। তবে একটা কথা—আমরা নিরামিষ খাই। মাছ, মাংস খেতে চাইলে তোমাকে বাইরে গিয়ে খেতে হবে। অবিশ্যি শাক-সবজি ফলমূল দুধ-মিষ্টিতে যদি তোমার অরুচি না হয় তাহলে বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে বলে মনে করি না।'

নিরামিষ শুনে গোড়ায় মনটা দমে গেস্‌ল, কিন্তু শেঠজীর বাড়ির নিরামিষ রান্না এমনই সুস্বাদু, আর বাড়ির গরুর খাঁটি দুধের মালাই-বালাইয়ের এমনই কোয়ালিটি যে মাছ-মাংসের অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।

গঙ্গারামের সবসুদ্ধ সাত ছেলে। তার মধ্যে দুটি অল্প বয়সেই মারা গেছে, দুটি আর্মিতে, দুটি বাপের ব্যবসায় যোগ দিয়েছে আর ছোটটি হলেন শ্রীমান মহাবীর বিচ্ছু। আমার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গারাম ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে পর 'ইনি তোমার নতুন মাস্টর' বলে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'যাও, এঁকে এঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এস।'

এমন অস্থির চোখের দৃষ্টি আমি কোনো ছেলের মধ্যে দেখিনি, আর সেই সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ ঝিলিক। সে যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও যে বেশ ধারালো সেটা বোঝা যায়।

গদি থেকে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে আরেকটা উঠোনে পৌঁছলাম। তারই পাশে বারান্দার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে হাজির করল মহাবীর। বোঝাই যাচ্ছে এটা শিস-মহল জাতীয় একটা কিছু ছিল, কারণ ঘরের সারা দেয়াল আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া।

আমাকে পৌঁছে দিয়েই মহাবীর যে কেন চম্পট দিল সেটা মিনিটখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলুম।

ঘরের মেঝেতে দুটি এবং খাটের ওপর একটি জ্যান্ত বিছে অবস্থান করছে। মেঝের দুটি তেঁতুলে, আর খাটের ওপরেরটি একেবারে খোদ কাঁকড়া বিছে। শেষেরটি আপাতত খাটের মধ্যিখান থেকে বালিশ লক্ষ করে এগুচ্ছে। আমি জানি মেঝের দুটি চেহারাতেই যা ভয়ের উদ্রেক করে, কামড়ে বিষ নেই। তবে বিছানার উপরে যেটি, তার ল্যাজের ডগায় বাঁকানো হুলটির ছোবল একেবারে মারাত্মক।

'বিচ্ছু' বিশেষণের তাৎপর্য যে এই ভাবে প্রথম দিনেই বোঝা যাবে সেটা ভাবিনি।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে 'মহাবীর' বলে একটা হাঁক দিলুম। তাতে উত্তর না পেলেও, ডাকের ফলে উল্টোদিকের বারান্দায় স্বয়ং শ্রীমানের আবির্ভাব হল। হেলতে দুলতে সে এসে দাঁড়াল একটা থামের পাশে। আমি তাকে ডাকলুম।

'ইধার আও।'

বিচ্ছু এগিয়ে উঠোনের মাঝবরাবর এসে আবার থামলো।

'হাত দিয়ে বিচ্ছু তুলতে পার?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

শ্রীমান নিরুত্তর।

'এস। দেখে যাও কী করে তোলে।'

এবার শ্রীমানের কৌতূহল হল। এখানে বলে রাখি আমি নিজেও কোনোদিন হাত দিয়ে কাঁকড়াবিছে তুলিনি। তবে সেটা যে সম্ভব তা জানি, কারণ ছেলেবেলায় গণশা বলে আমাদের একটা চাকর ছিল তাকে এ জিনিস করতে দেখেছি। খপ্ করে ঠিক হুলের তলাটা ধরে তুলে ফেললে হুল ফোটাবার আর মওকা পায় না বিছে।

মহাবীর আমার ঘরের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়াল।

আমি দম টেনে এক বুক সাহস নিয়ে দুগ্গা বলে এক ছোবলে খাটের উপর থেকে বিছেটাকে ল্যাজ ধরে তুললুম। তারপর সেটা দু আঙুলে ঝুলিয়ে মহাবীরের মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বিছেগুলোকে বাইরে ফেলে আসার জন্য একটা পাত্র নিয়ে এস। আর দেখছই তো—আমার যখন ভয় নেই, তখন আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো মজা নেই।'

মহাবীর এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাঁচের বৈয়াম নিয়ে এল। তার ভেতরের দেয়ালে লাড্ডুর গুঁড়ো লেগে রয়েছে। তারই মধ্যে প্রথমে কাঁকড়া বিছেটাকে, তারপরে তেঁতুল বিছে দুটো ফেলে বললুম, 'এগুলোকে বাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফেলে এস।'

মহাবীর গেল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে রিপোর্ট করে গেল যে সে আমার আজ্ঞা পালন করেছে।

তারপর থেকে মনে হত যে প্রাইভেট টিউটরের প্রতি তার যে স্বাভাবিক বিরাগ সেটা মহাবীর কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। কতটা কাটিয়েছে সেটা জানা মুশকিল, কারণ এমনিতে সে অত্যন্ত চাপা। পেটে বোমা মারলেও মনের আসল ভাব সে প্রকাশ করবে না। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত চৌকস, কাজেই লেখাপড়ায় যাতে তার মন বসে সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তাতে সফল হই বা না হই। দুষ্টুমি বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ আমি জানি সেটা মাঠে মারা

যাবে। ত্যাঁদড়ামোর দৌড় যে কতখানি সেটা এক দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে।

গঙ্গারামের বাড়িতে চারটে ঘোড়া, ছটা উট। একদিন সকালে মনিবের চিঠি টাইপ করছি গদিতে বসে, এমন সময় হঠাৎ সমস্বরে অনেকগুলো উটের আর্তনাদ শুনে আঁৎকে উঠলুম। উটের ডাকের মতো অমন বীভৎস ঘড়ঘড়ে ডাক আর কোনো জানোয়ারের নেই।

কৌতূহল হওয়াতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—জোড়া জোড়া উট বোধহয় পরস্পরের দিকে পিঠ করে বসেছিল, কোন্ এক ফাঁকে গিয়ে শ্রীমান এর-ওর ল্যাজে গাঁটছড়ার মতো করে বেঁধে দিয়ে এসেছে। বসা উট দাঁড়িয়ে উঠতে ল্যাজে টান পড়ার ফলেই এই বিকট চিৎকার।

গঙ্গারাম এ ব্যাপারে ভয়ংকর আপসেট হয়ে পড়াতে তাকে বুঝিয়ে বললুম যে এ ধরনের দুষ্টুমির বয়সটা মানুষের খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না ; তোমার ছেলের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ; সে পড়াশুনোয় ভালো হবে এ গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না। এত বলার পর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মহাবীরকে পড়ানোর টাইম ছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা। একতলার পিছন দিকে আমার ঘরের উল্টোদিকে একটা ঘরে বসে পড়াশুনা হত। আমি গিয়ে বসলেই বেয়ারা এক গেলাস সরবত দিয়ে যেত। সেটা যে কিসের সরবত তা কোনো দিন ঠাহর করতে পারিনি, তবে বলতে পারি এমন সুস্বাদু সুগন্ধী সরবত আর কোনোদিন খাইনি। সরবত শেষ হতে না হতেই ছাত্র এসে পড়তো।

একদিন দেখি ছেলে আর আসে না। আমি ঘড়ি দেখছি থেকে থেকে ; বিশ মিনিট হয়ে গেল, পঁচিশ মিনিট, এক ঘণ্টা, তবু সে আসে না। দেরির কী কারণ হতে পারে বুঝতে পারছি না, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমান এসে হাজির।

'কী ব্যাপার বল তো ?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'এত দেরি কেন ?'

'তোমায় একটা জিনিস দেখাব তাই', বলল শ্রীমান। 'বাবার নেশা পুরোপুরি না হলে ট্যাঁক থেকে চাবি বার করতে পারছিলাম না।'

সর্বনাশ ! বাবার ট্যাঁক থেকে চাবি ? শেঠজী যে গাঁজা জাতীয় একটা কিছু সেবন করেন সন্ধ্যাবেলা সেটা জানতাম।

'কিসের চাবি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সিন্দুকের', বলল শ্রীমান বিচ্ছু।

তারপর পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে ঠক করে টেবিলের উপর রাখল। ল্যাম্পের আলোয় সেটার চোখ ধাঁধানো ঝলসানি আমায় থমকে দিল।

জিনিসটা একটা সোনার লকেট। সাইজে ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো। মাঝখানে একটা আধুলি-প্রমাণ সবুজ মণি, নির্ঘাৎ মরকত বা পান্না,—তাকে ঘিরে

আছে হীরের বলয়, আর তাকে আবার ঘিরে আছে সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে বসানো চুনি আর পান্না।

'জাহাঙ্গীর বাদশার জিনিস ছিল এটা', চাপা গলায় বলল মহাবীর। 'বিশ লাখ টাকা দাম। বাবা কাউকে দেখান না, কাউকে বিক্রী করবেন না।'

'আর তুমি এটা সিন্দুক থেকে বার করে নিয়ে এলে ?'

'বাঃ, এটা তোমাকে দেখাব না ? তোমার দেখা হলে আবার রেখে দিয়ে আসব।'

আমি অবাক হয়ে একবার লকেটের দিকে, একবার মহাবীরের দিকে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল শ্রীমান।

'টোটা সিং-এর নাম শুনেছ ?'

'কে টোটা সিং ?'

'আসল নাম কেউ জানে না। ডাকু টোটা সিং। পুলিশ ধরে জেলে পুরেছিল, ও জানলার গরাদ হাত দিয়ে বেঁকিয়ে পালিয়ে যায়।'

এবার মনে পড়ল। কোনো একটা কাগজে পড়েছিলাম বটে। রাজপুত ডাকাত, রাজপুত্রেরই মতো চেহারা। ফরসা রং, কিন্তু ডাকাতি করে মিশকালো ভীলদের সঙ্গে। ভারী রহস্যময় চরিত্র। পুলিশ জেরা করেও কিছু জানতে পারেনি। দুর্ধর্ষ সাহসী, আর বন্দুকের অব্যর্থ নিশানা। গায়েও নাকি প্রচণ্ড শক্তি।

'হঠাৎ টোটা সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

'আমাদের বাড়িতে ডাকাত এলে মজা হবে।'

আমি তো থ ! বললাম, 'এসব কী বলছ তুমি ?'

'গোলাগুলি চলবে, আর মজা হবে না ?'

'এসব কথা বোল না, মহাবীর। যদি লোক খুন হয় সেটা কি খুব ভালো হবে ?'

মহাবীর আর কিছু বলল না। তার উৎসাহের সঙ্গে আমার উৎসাহ মেলাতে পারলাম না বলে বোধহয় সে কিছুটা হতাশ হল। তাকে লকেটটা দিয়ে বললাম, 'যাও, এটা রেখে এস বাবার সিন্দুকে।'

মহাবীর বাধ্য ছেলের মতো লকেটটা নিয়ে বেরিয়ে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। সেদিন আর তেমন জমিয়ে পড়াশুনা হল না।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে লকেটটার কথা আর সেই সঙ্গে কী বিপুল ধনদৌলতের মধ্যে রয়েছি আমি সেই কথাটা ভাবছিলাম। আমার ঘরের উপরেই শেঠ গঙ্গারামের ঘর। শেঠজীর ইনসম্‌নিয়া, রাত আড়াইটা তিনটার আগে ঘুম আসে না। নেশার ফলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা তন্দ্রার ভাব আসে। তারপর

দশটা থেকে একেবারে সজাগ। এই ব্যারাম হোমিওপ্যাথিতে সারেনি। তাই শেঠজী অ্যালোপ্যাথির ঘুমের বড়ি খান। কিন্তু যতক্ষণ না ঘুমের আমেজ আসে ততক্ষণ ঘরে পায়চারি করেন। তাঁর পদধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি আমার মাথার উপরে।

ক্রমে সেই পায়ের শব্দও থেমে গেল, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঢংঢং করে গদির ঘরের জাপানী দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল, আর তারই কিছুক্ষণ পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

একে টেলিপ্যাথি বলব না কী বলব জানি না ; আজই সন্ধ্যায় ডাকাতের কথা হল, আর আজই ডাকত পড়ল শেঠ গঙ্গারামের বাড়ি !

প্রথমে সন্দেহ হল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে। তারপর ঘোড়ার চিঁহিহি আর উটের পরিত্রাহি আর্তনাদ। তারপর হৈ হল্লা আর পর পর তিনটে বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আমি খাটের উপর সটান উঠে বসলাম। ঘর থেকে বারান্দায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় বেশ কিছু লোকের এক সঙ্গে দ্রুত পায়ের শব্দে সমস্ত বাড়িটা গমগম করে উঠল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদিকের বারান্দায় প্যাসেজের ভিতর দিয়ে বাইরের উঠোনের যে অংশটা দেখা যায়, তাতে আলোকরশ্মির ছটফটানি দেখে বুঝলাম কে বা কারা যেন টর্চ ফেলছে।

মাথায় রোখ চেপে গেল। শেঠজীই আমাকে একটা রিভলবার দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাড়িতে ডাকাত যদি পড়েই থাকে তো এভাবে কেঁচো হয়ে ঘরে বসে থাকলে বাঙালীর মুখে যে কালি পড়বে !

কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে বেরনোমাত্র একটা বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পিছনের একটা কাঁচের জানালাকে চৌচির করে দিল। আমি বেগতিক দেখে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। গোলাগুলি চললে এটাই যে প্রশস্ত পন্থা এটা আমার জানা ছিল। তাও উপুড় অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে একজন বন্দুকধারীর দিকে গুলি চালিয়ে দিলুম। লোকটা আর্তনাদ করে কোমরে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ অমাবস্যা, কিন্তু উঠোনের উপরে ছাত নেই বলে তারার আলোতে তবু কিছুটা দেখা যাচ্ছিল।

এই ভাবে কুরুক্ষেত্র চলল মিনিট কুড়ি। শেঠজীর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র দারোয়ান ছিল গোটা আষ্টেক। কাজেই যুদ্ধ যে শুধু এক তরফাই ঘটেছে তা নয়।

ক্রমে হল্লা, আর্তনাদ, গুলির শব্দ, পায়ের শব্দ ইত্যাদি সব কিছু থামার পর আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। তখন এদিকে ওদিকে বাতি জ্বলতে শুরু

করেছে। ওপর থেকে মেয়েদের ঘোর বিলাপ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, রেড সাক্সেসফুল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মহাবীর দৌড়ে নেমে এল দোতলা থেকে। সে আমার ঘরেই যাচ্ছিল, মাঝপথে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে পাকা খবর দিয়ে দিল।

টোটা সিং ডাকাতের দল বিস্তর ধনরত্ন লুট করে নিয়ে চলে গেছে, ইনক্লুডিং শেঠজীর সিন্দুক খুলে জাহাঙ্গীর লকেট। শেঠজী নিজে নাকি বিপদ বুঝে গিন্নী ও মহাবীরকে নিয়ে ছাতে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে প্রতাপ ও রঘুবীর বন্দুক নিয়ে ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—দুজনেই জখম। এ ছাড়া দুটি প্রহরী মরেছে, আরেকটির পায়ে গুলি লেগেছে।

কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়।

পুলিশে ডায়রি ইত্যাদি যা করবার সে তো হলই। এখানে বলে রাখি যে শেষ পর্যন্ত ইনস্পেক্টর যশোবন্ত সিং এবং তাঁর দলের লোকেরা জাহাঙ্গীর লকেট সমেত চোরাই মালের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, ডাকাতদলের সাতজন ধরা পড়েছিল, তবে টোটা সিং উধাও। কিন্তু এ সবের আগে আমাকে জড়িয়ে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ডাকাতির দুদিন পরের সন্ধ্যেবেলা।

ছাত্র পড়ানোর ঘরে গেছি যথারীতি সাতটার সময়, সরবতও খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলাম মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। ছাত্র তখনো আসেনি, এদিকে ক্রমেই বুঝতে পারছি যে চোখের সামনের জিনিসগুলো দেখতে যেন রীতিমতো কষ্ট করে দৃষ্টি ফোকাস করতে হচ্ছে।

কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না, শুধু এটুকু বুঝছি যে এ অবস্থায় পড়ানো অসম্ভব।

এমন সময় শ্রীমান মহাবীর সিং-এর প্রবেশ। তার হাতে একটা হলদে কাগজ—হ্যান্ডবিলের মতো।

অবাক হয়ে দেখলাম তাতে আমারই ছবি।

'টোটা সিং', বলল মহাবীর, তার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

টোটা সিং? কী বলছে ছেলেটা পাগলের মতো। স্পষ্ট দেখছি যে আমার ছবি—সেই গোঁফ, সেই ঝুলপি, সেই নাক, সেই চোখ!

'টোটা সিং', আবার বলল মহাবীর। 'ঠিক তোমার মতো দেখতে। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আটকে দিয়েছে আজই দুপুরে। ধরে দিতে পারলে দু হাজার টাকা পুরস্কার।'

আমি সেই অবস্থাতেই কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে চোখের একেবারে

সামনে এনে নীচের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলুম। বড় করে লেখা টোটা সিং-এর নামটা পড়তে কোনো অসুবিধা হল না। আর সেই সঙ্গে ছবির মাথার উপরে লেখা 'রিওয়ার্ড রুপীজ ২০০০।'

'পুলিশ তোমায় ধরতে আসবে,' বলল মহাবীর সিং। 'কিষণলাল বলল ও পুলিশে বলে দেবে তুমি এখানে থাক। ও দেখেছে দেয়ালের ছবি।'

কিষণলাল শেঠজীর দোকানের একজন কর্মচারী। লোকটা খুব সুবিধের নয় সেটা আমারও কয়েকবার মনে হয়েছে।

'তোমার জেল হবে,' বলে চলেছে মহাবীর সিং। আমার জেল হলে সে যেন রেহাই পায় এমনই তার ভাব। এই অদ্ভুত প্রায়-বেহুঁশ অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম যে এ ছেলেকে আমি বশ করতে পারিনি। সে আমার প্রতি যেমনি বিরূপ ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। জিভও জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি যে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি। চেহারায় যখন এতই মিল তখন গঙ্গারামও আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শেষটায় হাতে হাতকড়া!

ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে উঠোন পেরিয়ে কোনো মতে আমার শিস-মহলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর শোয়ামাত্র অঘোরে ঘুম!

পরদিন ঘুম ভাঙল পুরুষ মানুষের গলার শব্দে। ভারী গলায় কে যেন ইংরিজী-হিন্দী মিশিয়ে কথা বলছেন আমার ঘরের কাছেই।

'আমাদের ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে এ বাড়িতে সে লোককে দেখা গেছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই। ছাব্বিশটা ঘর এই হাভেলিতে। লুকোবার জায়গার কি অভাব আছে?'

আমি প্রমাদ গুনলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে আমারই ঘরের দিকে।

এবার গঙ্গারামের কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এ বাড়িতে টোটা সিং লুকিয়ে থাকবে আমার অজান্তে? এটা কী করে সম্ভব হয় ইন্‌স্পেক্টর সাহেব?'

দরজার বাইরে লোক। আমি বিছানায় কনুইয়ে ভর করে আধশোয়া। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতর ধড়ফড়ানি। এখনো মাথা ভার; কাল যে কী হল এখনো বুঝতে পারছি না।

চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ঢুকে এলেন উর্দি পরা দারোগা। আমার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে 'সরি' বলে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর বারান্দার

ডান দিক দিয়ে মিলিয়ে এল।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তাহলে কি কালকের ছবিটাও মহাবীরের আরেকটা বিচ্ছুমি ? শুধু আমার মনে একটা প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য ?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

দেয়ালের দিকে চোখ গেল।

দেয়ালে সর্বাঙ্গে আয়নার টুকরো। তাতে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। একটা নয়, অগুন্তি।

কিন্তু এ মুখ যে বদলে গেছে!

আপনা থেকেই আমার হাতটা মুখের উপর চলে এল।

কোথায় আমার টোটা-মার্কা তাগড়াই গোঁফ ? আমি যে ক্লীন-শেভ্ন!

আর আমার মাথার চুলের এ কী দশা ? এ যে প্রায় কদম ছাঁট!

দোর গোড়ায় এখন দাঁড়িয়ে মহাবীর সিং—তার চোখে মুখে শয়তানী হাসি।

'কাল সরবতে কী ছিল ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কী ছিল ?'

'বাবার চারটে ঘুমের বড়ি। তুমি ঘুমোলে পর দাদার ক্ষুর দিয়ে আমি তোমার গোঁফ কামিয়ে দিই, আর কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিই। না হলে তোমায় ধরে নিয়ে যেত। এখন ওরা বুদ্ধু বনে যাবে।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মহাবীরের দিকে। এমন ফন্দির কি তারিফ না করে পারা যায় ? আর সে যে সত্যি আমার বন্ধু, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর আছে ?

'সাবাস, মহাবীর', আমি এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'জিতে রহো।'